পার্থসারথি

"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার মোক্ষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৭তম বর্ষ)

https://www.parthasarathipatrika.com



৮০ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই অগ্রহায়ণ , ১৪৩৩ / 24.11.2026

-ঃ সম্পাদক ঃ- সুনন্দন মোক্ষ

- সূচিপত্র -

(৮০তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

চার দশকের পূর্ণতা	শ্রী সুনন্দন ঘোষ
গীতায় দিব্যজীবন লাভের উপায়	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
পার্থসারথি চক্রের সভাপতির ভাষণ	ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরানো সেই ভ্রমণ কথা	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য
প্যাপিরাসের পাতা	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

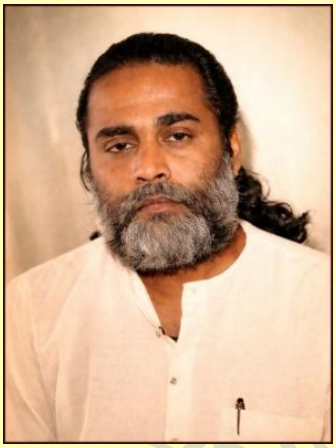

[১০.০৩.১৯২৬ – ২৪.১১.১৯৮৬]

চার দশকের পূর্ণতা

সুনন্দন ঘোষ

কেটে গেল চার চারটে দশক। বিদায়ের কালে শ্রীপ্রীতিকুমারের বয়স ছিল ষাট বছর। এখন তিনি শতাব্দী-প্রাচীন। তবু তাঁর কথা তাঁর প্রীতি-কণা আজও আকর্ষণ করে বর্তমান প্রজন্মকে।

যাঁরা আত্মকথা পড়েন, তাঁরা জানেন পার্থসারথি পত্রিকার যাত্রাপথ কোনদিনই সুগম ছিল না। খেলা, রাজনীতি, বিনোদন বিষয়ক পত্রিকার যে বাণিজ্যিক চাহিদা থাকে, সাধারণভাবে একটি ধর্ম জাতীয়তাবাদী পত্রিকা তার ধারে কাছে আসতে পারে না, বৃহৎ কোন প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য যদি না থাকে।

বাবা চলে যাওয়ার পর পত্রিকার অর্থনৈতিক দিক সামলাতেন মা, প্রকাশনার কাজ করতাম আমি। দু' জনেই ছিলাম আধা সরকারী চাকুরীজীবি যাদের সেই যুগে বেতন ছিল কৃশ। তখনকার প্রতিষ্ঠান-বিরোধী সমাবেশে একটা প্রচলিত বিদ্রুপাত্মক স্লোগান ছিল – "পুলিশ তুমি যতই মারো, তোমার মাইনে একশো বারো।"

পার্থসারথির জন্ম হয়েছিল আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডলে, তাই প্রতিটি প্রকাশিত সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠানো হত বিভিন্ন মঠ মিশনে, কিছু রাজ্যের গ্রন্থাগারে। পাঠকদের বড় অংশ ছিলেন দীর্ঘদিনের। বছর বছর প্রকাশনা ও ডাক মাশুল বাড়লেও পত্রিকার মূল্য থাকত প্রায়শই অপরিবর্তিত। তাই পত্রিকা থেকে আয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না কখনও।

অনেকটা মাদারীর খেলার মতো - পড়ে গেল পড়ে গেল হয়েও প্রতি বছর নেহাতই দৈব অনুগ্রহে থেকে যেত শ্রীপ্রীতিকুমারের স্বপ্নের জাতক।

ডিজিটাল জগতে পা রাখার পর বদলেছে অনেক কিছু। এখন প্রতিমাসের মুদ্রণের ব্যয় নেই, নেই পোস্টাল খরচ, বারবার প্রেসে ছোটা, গ্রাহকদের তালিকা ঠিক রাখা। এখন ওয়েবসাইটের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ যা আছে, তা'ও বিপুল, কিন্তু বাৎসরিক বা পঞ্চবার্ষিকী। আমার রিটায়ারমেন্টের পর সেটা আর উদ্বেগের কারণ হয় না, কারণ প্রস্তুতি থাকে যথেষ্ট আগে থেকে।

শ্রী প্রীতিকুমারের আশীর্বাদে এখন ইংরাজী মাসের ২৪ তারিখে বই প্রকাশিত হয়। দিন পেরিয়ে গেলে কদু কেউ নম্র ভাবে তাগাদা দেন – 'এই মাসে বই কিন্তু পাই নি।' পাঠাতে সত্যিই ভুল হয় কখনও কখনও। কখনও নেট ওয়ার্কের সমস্যাও থাকে।

মোটের উপর তিরোধানের চল্লিশ বছর পরেও শ্রী প্রীতিকুমারের সান্নিধ্য আমরা লাভ করে চলেছি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।

জয়তু শ্রী প্রীতিকুমার! জয়তু পার্থসারথি!!

গীতায় দিব্যজীবন লাভের উপায়

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

মানবজীবনের পরমতম লক্ষ্য পূর্ণতা অর্জন। সনাতন মানবধর্মের আকর গ্রন্থ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়" প্রেয় লাভের যে পন্থা নিরূপিত হইয়াছে তত্ত্বদর্শী সাধকগণের মধ্যে যুগে যুগান্তরে তাহার ব্যাখ্যা লইয়া দ্বন্দ্ব ও মতদ্বৈধতা বিদ্যমান। আচার্য শঙ্করের মায়াবাদী প্রতিভার প্রসাদে শ্রীমদ্ভগবদগীতা সর্বসাধারণ্যে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে সংসার-ত্যাগীদের শাস্ত্ররূপে। কিন্তু বিবর্তিত চেতনার আলোকে আজ ইহা প্রতীয়মান - গীতা সন্ন্যাসীদিগের জন্য রচিত হয় নাই। সংসারাশ্রয়ী মানবের নিত্যদিনের পথচলার সঙ্কটমুহূর্তে যে দুরূহ জিজ্ঞাসা তাহার বিচারশক্তিকে বিভ্রান্ত করে, গতিময়তাকে প্রতিহত করে এবং অভিমুখকে পরিবর্তিত করে - সেই সকল প্রশ্নের চরম সমাধানের মাধ্যমে মানবের দিব্যজীবন লাভের উপায় গীতা। গীতায় অর্জুনের অহংবোধসঞ্জাত অবসাদ প্রণোদিত কর্মত্যাগের প্রচেষ্টাকে তামসিকতা ও ক্লৈব্য বলিয়া ধিকৃত করা হইয়াছে এবং এই বাহ্যসন্ন্যাস ও সংসার ত্যাগের প্রয়াসকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

গীতার কর্মযোগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে Basic Concept বা মূলতত্ত্বানুগামীতার।

আচার্য শঙ্করাদি গীতার ভাষ্যকারদের মতানুসারে এই জগতের মূল ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা ও অজ্ঞানদায়িনী অপরা প্রকৃতি। ইহা ত্রিবিধ দুঃখের কারণ এবং সতত পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়সের বন্ধনে প্রবৃত্তা। পুরুষ অপরিবর্তনীয় বিকারহীন নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু অহংবোধে পুরুষ প্রকৃতির ক্রীড়ালীলায় আত্মপ্রক্ষেপ করিয়া দুঃখবেদনার অধিকারী হয়।

পুরুষার্থের তাৎপর্য প্রকৃতির নিম্নাকর্ষী বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া আত্মচৈতন্যের উৎকর্ষতাসাধন। গীতার সাধনা এইরূপ ভেদবিচারের যাথার্থ্য প্রাথমিক স্তরে স্বীকার করিয়াও মহত্তর জ্ঞানের মহিমায় সম্প্রসারিত হইয়াছে। তাহার মতে সাংখ্য যোগে উক্ত এইরূপ মুক্তির অর্থ জীবনের লীলাময়তা হইতে বুদ্ধির প্রত্যাকর্ষণ করিয়া

একান্ত নৈষ্কর্ম্যের শান্তিতে মগ্ন হওয়া। এই আত্মাভিমুখী কর্মহীনতা চরম সত্য হইলে প্রকৃতির সৃজনীস্পৃহা প্রতিহত হয়, সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু গীতা ঐ স্থিতিময় নিশ্চল পুরুষের অতীত এক সত্যের সন্ধান দিয়াছে - তিনি পুরুষোত্তম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭/৬

সর্বভূত এই প্রকৃতি হইতে জাত হইতেছে, আবার 'আমি' (পুরুষোত্তম)-ই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থল। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন- "মত্তঃ পরতরংনান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"। (৭।৭)। "আমি-ই শ্রেষ্ঠ সত্তা"। শাঙ্কর ব্যাখ্যায় যে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সগুণ ব্রহ্মেরও উর্দ্ধে যাঁহার স্থান, তিনি গীতার **অক্ষর পুরুষ**, এবং ঐ সগুণ ব্রহ্ম গীতার **ক্ষর পুরুষ**। এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ **পুরুষোত্তম** সত্তার খণ্ডিত রূপমাত্র। তাঁহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অক্ষর পুরুষের শান্তিময় নির্লিপ্তি এবং বাহিরে ক্ষর পুরুষের কর্মময়তা। নিজের প্রকৃতির সহিত সংবদ্ধ হইয়া তিনি জগতের অনন্ত কর্ম অক্লান্তভাবে পালন করিতেছেন। বস্তুতঃ যে মায়াশক্তিকে শঙ্কর জগতের কারণরূপে নিরূপিত করিয়াছেন এবং "জড়স্বভাবা মিথ্যাভূতা সনাতনী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন- তিনি এই পরা প্রকৃতি- পুরুষের সহিত অভিন্না- আদ্যাসৃজনী ও কর্ম শক্তি। বিশ্বপ্রপঞ্চ এই চিদ্-ময়ী শক্তির লীলাময় প্রকাশ। অপরা প্রকৃতি পরা প্রকৃতি হইতেই উদ্ভুতা আলোকহীনা পরিণাম। এই কারণে জগৎ সত্য - ব্রহ্ম সত্যতর।

সেই পুরুষোত্তমে আপনাকে লীন করিতে হইলে অক্ষর পুরুষের নিষ্ক্রিয় প্রশান্তি আত্মস্থ করিয়া ক্ষর পুরুষের কর্মসাধনের অনুসরণ করিতে হইবে। ফলশ্রুতিতে মানবের অন্তর্প্রকৃতি হইবে অনাসক্ত এবং বর্হিপ্রকৃতি জগতে পুরুষোত্তমের কর্মসম্পাদনের যন্ত্র হইয়া উঠিবে। ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জিত এই কর্মের স্বরূপই গীতার **"পূর্ণযোগ"**।

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার" বিবিধ অধ্যায়ে এই তত্ত্বই ক্রমাভিব্যক্ত।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ব্রহ্মে লীন হইবার পন্থা দ্বিবিধ- "জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্" হইলেও-

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বং প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩/৫

প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের অধীনে স্থূলদেহী মানব ক্ষণমাত্রও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার জীবনধারণই প্রকৃতপক্ষে এক মহৎকর্ম।

কর্মের সংজ্ঞা লইয়া জ্ঞানবাদীগণেরও মধ্যে বিরোধ বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-কাম্য কর্মত্যাগকে দ্রষ্টাগণ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, জ্ঞানীগণ কর্মফলে আসক্তিশূন্যতাকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন (১৮।২)। নিয়তকর্মের পরিত্যাগ যুক্তিসম্মত নহে। মোহবশে এই ত্যাগ তামসিকতাকেই ব্যক্ত করিয়া থাকে (১৮/৭)। বহুব্যক্তি "নিয়তং" কর্মের অর্থ বুঝিয়া থাকেন নিত্যকর্ম। কিন্তু গীতার তাৎপর্য অনুসারে নিত্যকর্মের অর্থ নিয়ন্ত্রিত কর্মাবলী। এই নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয় শাস্ত্র, স্বভাব অথবা সেই পরমপুরুষ কর্তৃক।

যে ব্যক্তি অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশলাভ করিয়াছেন তাঁহার সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছে। সতত আনন্দ-আপ্লুত নিরুদ্বিগ্ন নিত্যতৃপ্ত সেই পূর্ণমানবের আপনার জন্য আর কর্মের প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তথাপি তাহার কর্মহীনতার অবকাশ থাকে না। সর্বভূতে অনাসক্ত এই মানবের কর্তব্য হইয়া উঠে পরম নির্লিপ্তির সহিত বৃহত্তর জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হওয়া।

পরিণামবিমুখ এই মহত্তর কর্মচেতনার প্রবোধনই কর্মযোগের মূল তত্ত্ব। এই কর্মযোগের সাধনে যিনি নিবিষ্ট হন, স্ব-প্রকৃতির দিব্যরূপান্তর সাধন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। (৩/১৭,১৮)

আপনাকে উদাহৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন – "ত্রিলোকমধ্যে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, অতএব করণীয়ও কিছু নাই; তথাপি আমি সতত কর্মে প্রবৃত্ত।" (৩/২২)

এই মহত্তর কর্মসাধনের তাৎপর্য নির্দেশ করিতে গিয়া গীতা বলিয়াছেন- সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে এবং তাহার কর্মকে অনুসরণ করিয়া থাকে। (৩/২৩)

অতএব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য কর্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগকে বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণে প্রবৃত্ত না করা। তিনি ঈশ্বরের সহিত সতত যোগযুক্ত থাকিয়া জাগতিক কর্মাদি পালনপূর্বক তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত রাখিবেন। কারণ, যাহাদের প্রকৃতি কর্মাশ্রয়ী তাহাদিগকে কর্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করিলে তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ সম্ভাবিত হয়। কর্মহীন এই লোকসকল কর্মযোগের তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞানতা হেতু জীবনসংগ্রাম হইতে পশ্চাদপসারণ করিলে তাহাদের প্রকৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়, নীতি ধর্ম সমাজ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যদ্বারা কবলিত হয়।

কর্মানুষ্ঠান জীবের স্ব-ধর্ম অর্থাৎ স্ব-ভাব বা প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। মূল প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে হইলে সর্বাগ্রে কর্তব্য প্রকৃতির অবিদ্যার কারণ কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অশুভ প্রেরণাসকলের বিনাশ-সাধন। সকল ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয়ে আসক্তি ও অনীহা বর্তমান। ইহারা কল্যাণের মার্গে অন্তরায়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কামের প্রভাবে জ্ঞানহীন। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া বা প্রকৃতিস্থ নিম্নাভিমুখী আত্মশক্তিকে উর্দ্ধের শ্রেষ্ঠতর চিদ্‌শক্তির প্রভাবে শান্ত করিয়া কামকে বিনষ্ট করা সম্ভব।

অতঃপর যে গুণত্রয়ের প্রভাবে মানবের অহংবোধ তাহার আত্মচেতনাকে আবৃত করিয়া রাখে কর্মযোগের প্রভাবে উহা ক্রমে বিদূরিত হয়। অহং নয় প্রকৃতিই সর্ব কর্মের হোত্রী - অহংবিচ্যুত মানবের এই বোধই মানবের সকল কর্মকে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদনে উদ্বোধিত করিয়া তাহাকে জ্ঞানযজ্ঞে প্রবৃত্ত করে। অসূয়াবর্জিত মানব পরমপুরুষের প্রতি সতত শ্রদ্ধাবান থাকিয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। (৩/৩১)। অন্তর্নিহিত দিব্যপ্রকৃতির বিকাশে দিব্যচেতনায় উত্তীর্ণ মানব ঈশ্বরের ন্যায় সকল অপূর্ণতার অতীত হইয়া বিশ্বলীলার আনন্দে নিষিক্ত হয়।

"জয়তু পার্থসারথি"!

এবার শুরু করব একটি দুঃখের সংবাদ দিয়ে। সে দুঃখ আর কারও নয় আমার নিজস্ব। আমার কাছে এটা শোকের মতোই। তবে মানুষের তো সবই সয়ে যায়। শ্রী প্রীতিকুমার রইলেন না, আমিও থাকব না, পার্থসারথিও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রী প্রীতিকুমারের একটি কথা ছিল - পার্থসারথি আমার ধ্যান, পার্থসারথি আমার সাধনা। "গীতা" রপ্ত করতে করতে "পার্থসারথি"-তে তিনি আত্মমগ্ন হয়ে ছিলেন। সেই পার্থসারথি বন্ধ হতে বসেছে।

শ্রী প্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর আমি এবং সুনন্দন প্রাণপণ চেষ্টা করেছি যাতে পার্থসারথি বন্ধ না হয়ে যায়। মাসিক বেতন পাবার পর আগে প্রেসের টাকা সরিয়ে রাখি। মিথ্যা কথা বলব না প্রেসের কর্তারাও কোনদিন কোনও টাকার জন্য তাগাদা দেন নি। দু' মাসের টাকা একমাসেও পেমেন্ট করেছি। কিন্তু এবার প্রেস কর্তৃপক্ষ পুত্তরের কাছে ঘোষণা করেছেন মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যয়বৃদ্ধির কথা। গত আটবছরে পার্থসারথি ছাপাবার ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কিশোর যখন সুস্থ ছিল দু-একটা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঐ সময়ে নীরেনদা, কিশোর আমাদের মামলাগুলি চালাতে এত সহায়তা করেছিলেন আমি কোন ভাবেই তাদের কাছে আর কিছু দাবী করতে পারি না। অন্য প্রেসে Rate দেখে কথাবার্তা আমি বলব না, কারণ শ্রী প্রীতিকুমার যে কোনও কারণেই হোক এই প্রেসটি ঠিক করে গেছিলেন। যদি পার্থসারথি ছাপানো হয় আমি এখানেই ছাপাতে চাই। যদি না ছাপাই পার্থসারথি আর প্রকাশিত হবে না। আমার পক্ষে মাসে নিজের বেতন থেকে ১৬০০-১৭০০ টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। আমার চাকরীও শেষ হয়ে আসছে। বাপী মুখটা চূণ করে বলল— "তুমি একহাজার টাকা দিও, আমি বাকীটা দেব।" আমি মোটামুটি যে কোনও decision-এ তাড়াতাড়ি আসি। রাতে অনেক চিন্তা করে পরদিন সকালে বাপীকে বললাম, "তুমি যদি ছশো, সাতশো বা আটশো টাকা দাও সেটা তো

সংসারের খরচ থেকেই যাবে। আমাদের তো কোনও অনির্দিষ্ট আয় নেই, তাহলে সংসার চালাবে কি করে?" চুপ করে থাকলো।

শ্রী প্রীতিকুমার আমাকে পার্থসারথি চালাবার নির্দেশ দিয়ে যাননি। দ্বিতীয়তঃ শেষ জীবনে আমার সাথে একা (নাতনী সঙ্গে ছিল) সীতাপুর (U.P.) Eye hospital-এ বারবার গেছিলেন। একদম শেষের বার আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, "তুমি আমাকে এবার সত্যি খুব সেবা করেছ। তারজন্য আমি তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছি।" সেই আশীর্বাদের ফল কি এই? দেড় হাজার, দুহাজার টাকা সংসার খরচ থেকে খরচ করা। একটিও বিজ্ঞাপন নেই। বিজ্ঞাপনদাতাদের সাথে আমার যোগাযোগ নেই। তারজন্য পরিচিত কাউকে তোয়াজ করা আমার একেবারেই স্বভাব বিরুদ্ধ। একজন বিজ্ঞাপনদাতা আছেন, তিনি বছরে একবার লোক পাঠিয়ে কিছু টাকা বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতির জন্যই এটুকু খরচ করেন। শ্রী প্রীতিকুমার থাকতে দেখতাম কেউ কাগজ কিনে দিচ্ছেন, কেউ ছাপার খরচ দিচ্ছেন, কেউ proof দেখে দিচ্ছেন। তাদের সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যেতো শ্রী প্রীতিকুমারের আশীর্বাদে। আজ তো তাদের সেই আশীর্বাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। তারা যথারীতি আশীর্বাদ পাবার জায়গা খুঁজে নিচ্ছেন। তবে একটা বিশ্বাস আমার আছে "পার্থসারথি" ছাপানো বন্ধ হলে কিছু বিভ্রাট দেখা দেবে। এটা আমার গত আট বছরের অভিজ্ঞতা। আমি মনে প্রাণে কষ্ট পেলে ভীষণ উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটে যায়।

আমার পক্ষে গ্রাহকদের চাঁদা বাড়ানো সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা ৩০ টাকা করলেও আমার ১৫০০, ১৬০০ টাকার ব্যবস্থা হবে না প্রতিমাসে। শ্রী প্রীতিকুমার সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন লাইব্রেরী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে Free-তে বই পাঠাতেন, সেটা আমিও বজায় রাখার চেষ্টা করি। ২৫০-৩০০ বই এভাবে বিনামূল্যে পোস্টাল খরচ বহন করে বিতরণ করা যাচ্ছে না। আমি ঠিক করেছি এবার পত্রিকাটি দ্বিমাসিক

হোক। সেই খরচ চালাতে না পারলে ত্রৈমাসিক হবে, না হলে ষান্মাসিক হবে, না হলে বার্ষিক সংখ্যা হবে। আমার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় "পার্থসারথি" প্রকাশ করা। গত আটবছরে অনেক সমস্যায় ভুগেছি, এখনও ভুগি। শ্রীমায়ের কথা বৃদ্ধ বয়সে মনে করি – "নিজের দোষ দেখো"। আজকাল তাই আমার অসুবিধা হয় না। কিশোর আমার সমস্যা শুনে বললো, "মামীমা আমি মাসে পাঁচশো টাকা করে দেব"। বুকের মধ্যে একটু শিরশির করে উঠলো। পার্থসারথিতে কিশোরের অনুদান দীর্ঘস্থায়ী হলে তো আমার ইচ্ছা পূরণ হয়। তবু আমি মুখে বললাম, "তুমি আর কত করবে? তুমি কি একাই তোমার মামার স্নেহ পেয়েছ? যারা দিনরাত মৌরসীপাট্টা করে ঝড়জল উপেক্ষা করে শ্যামবাজারে এসে "পার্থসারথি"-কে সাহায্য করবার নাম করে ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি, সুরক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, সন্তান লাভ, বাপের সম্পত্তির ভাগ, সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতেন তাঁরা কোথায় গেলেন"?

আমি একবার কিশোরের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলাম, "তোমার লাখ টাকা হোক"। সেটা বছর সাতেক আগের কথা। তারপর কিশোর লাখ টাকা অনেকবার রোজগার করেছে কিন্তু ভগবান তার যে Injection এর ব্যবস্থা করেছেন তার একটা ampule এর দামই এগারোশো টাকা।

তবু ছেলেটা সবার জন্য করে যাচ্ছে। আমি গত সাত বছর তার কাছে একটা করে demand place করে যাই। আমার মতলব হোল আমার চাওয়া শেষ না হলে তো তার ছুটি নেই। এবার ১৪০১ সালে নববর্ষে কিশোর আমাকে একটা Chord less Telephone gift করেছে। আর আমারতো সবসময় পৃথিবীর সেরা জিনিষই চাই। কারণ গত তিরিশ বছর আমি পৃথিবীর সেরা মানুষের সঙ্গে এবং সেরা জিনিষের মধ্যেই তো ছিলাম।

এবার একটা জিনিষ আমার খুব ভালো লাগলো - আমার পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে তার Senior Officer একটি সুন্দর বই (I Remember) present

করেছেন। ভদ্রলোকের উপহারের মধ্যে আমি ভীষণ স্নেহ ও সৌন্দর্য বোধের পরিচয় পেলাম। আমরা আজকাল কোনও অনুষ্ঠান করি না। তবু তাঁর কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল তিনি যদি একদিন আমাদের সাথে Lunch করেন, আমি খুব খুশী হব। ঈশ্বরের কাছে আমি তার মঙ্গল কামনা করি। এই একটি উপহারের মধ্য দিয়ে তিনি আমার মাতৃহৃদয়ের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রইলেন। আরেকটি জিনিষ আমাকে খুব আহত করেছে - আমার ছেলের জন্মদিনে কোনও শুভ কামনা কেউ জানায়নি। অথচ আমাকে সকলের জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, শ্বশুর শাশুড়ীর বিবাহ বার্ষিকী, ছেলে মেয়ের জন্মদিন সব মনে রাখতে হয়। না হলেও তারা মনে করিয়ে দেন। আমি এ ব্যাপারটা শ্রী প্রীতিকুমারের ইচ্ছের উপর ছেড়ে দিলাম।

মীরার আবার দিল্লী যাবার কথা ছিল। কিশোর মীরার হাতে খেতে চেয়েছিল বলে মীরা Ticket Return করে পরে টিকিট কাটলো। অথচ নিজের ভাসুরের মেয়ের বিয়েতে শত চেষ্টা করেও টিকিট বদলাতে পারলো না। মীরাকে আবার আমি আশীর্বাদ করেছি এরপর যেন তার গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারি। আমি কয়েকদিন আগেই সকালে সোমাকে বলেছি, "সোমা, আমি স্বপ্ন দেখলাম তোর মা গৃহপ্রবেশ করছে"। দেখা যাক্ কি হয়। তবে মীরার এবার একটা নিজস্ব সুখী গৃহকোণ দরকার। তার নিষ্ঠা তাকে অপ্রাপ্তির দুঃখ ভুলিয়ে দেবে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

পার্থসারথি সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কিছু দৃঢ়তা, পছন্দ-অপছন্দ থাকতেই পারে, কারণ পার্থসারথির দায়িত্ব আমি বহন করি। এতকাল যা করেছি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আনুগত্য থেকে করেছি। এখন যদি ব্যয়ভার বহন করতে না পারি, তাহলে জানব শ্রী প্রীতিকুমার এবার তাঁর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন।

মোটামুটি পার্থসারথির গ্রাহকরাই লেখা পাঠান। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামীজী দু-একজন লেখেন। স্বামী বিদ্যানন্দ গিরিজীর লেখাও আগে নিয়মিত প্রকাশিত হোত। তবে লেখা পাঠানোর অর্থ এই নয় যে তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়ে যাবে। লেখা অমনোনীত হলেও ফেরত যোগ্য নয়। সেকথা

বলে দেওয়াই আছে। ছাপার অক্ষরে নামটা দেখতে ও দেখাতে সবারই ভালো লাগে, কিন্তু সবাইকেই তো সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রতিমা দেবী একবার লেখা দিয়েছিলেন। সেটা বেশ কিছুদিন পর ছাপানো হয়েছিলো। তাঁর ঠিকানা আমি পাচ্ছি না।

এবার একটা দুঃখ স্বীকার করি। ফাল্গুন সংখ্যায় যে লেখকের নাম ছিল "অনিকেত" ছাপা হয়ে বেরোল "অনিঙ্কেত"। এখন পাঠকবর্গই বলবেন এমন ভুল ছাপানো প্রেসকে কি বেশী টাকা দেওয়া উচিত? আর পার্থসারথির যদি একেবারে মুদ্রণ বন্ধ হয়ে যায় সে প্রেসের অস্তিত্ব থাকবেতো? এ প্রেসতো শ্রী প্রীতিকুমারের নির্বাচিত, তাই তারা আমাকে ছাড়বেন, না আমি তাঁদের ছাড়ব, সেটাই দেখবার ... তাঁরা যা করেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। মলাটে যদি দুবার ছাপান "ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকা" আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। মনে করি "ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী" শব্দের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। বাপী ও আমি গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি অনেক। কিন্তু একমাত্র গীতাদি, অপু ও মনু ছাড়া আর কেউ সময়মতো হিসেব করে টাকা দেয় না। আমার সহকর্মীরা কেয়া, চিত্রা পাল ছমাস আগে চাঁদা জমা দিয়ে দেন। পারলে কিছু অর্থ সাহায্যও করেন।

সামনের মাস থেকে শ্রীমান সুনন্দন ঘোষ Telephone-এর Bill টা payment করবেন আশা করছি। অবশ্য ওর phone আসে এবং প্রতিদিন আসে। আবার কেউ কেউ ধরলে আধঘণ্টা লাইন আটকে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক ভদ্রলোককে আমার ধমকাতে হোল। আমি বললাম, "আমি তো ওর Secretary নই যে দু' মিনিট বাদ বাদ Phone attend করব। রোজই তো Office এ যায়। সেখানে দেখা করে দরকারি কথাগুলি সেরে ফেললেই হয়। একদিন রাত ১০ টায় Phone, জিজ্ঞাসা – "ঘোষ সাহেব এখনও বাড়ী ফেরেননি?" আমাকে বলতে হোল, "কি জানি, মাঝপথে আর কোথাও যায় বলেতো আমার জানা নেই।"

আমার Hd. Examinership এর duty ছিল। ফিরে শারজার ক্রিকেট দেখতাম। Final এর দিন duty সেরে ফিরে দেখি আমার পুত্র Office যাননি। তিনি Final খেলা দেখার জন্য Office কামাই করেছেন এবং যথারীতি India কে হারিয়েছেন।

আমি তাকে order করেছি in future কোনও Final খেলা দেখে সে যেন আর India-কে না হারায়।
আজ এই পর্যন্ত ...

(** রচনাকাল – মে, ১৯৯৪)



পার্থসারথি চক্রের সভাপতির ভাষণ (১৯৭৭)

ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ আমাদের একটি শুভদিন; এই সমিতির সদস্যদের সাধারণ সভা ও মিলন বাসর। আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানাই। যাঁর পুণ্যনামে এই চক্রের নামকরণ, তিনি আমাদের কল্যাণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে পূত কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে সেই পার্থসারথিকে আমাদের অকুণ্ঠ প্রণতি বারেবারে, যেন তিনি বিষাদগ্রস্ত আমাদের নষ্ট মোহ থেকে লব্ধস্মৃতি ও বিগতসন্দেহ করেন। গীতার বিখ্যাত উপদেশ, আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার মহিমা আমাদের সাধারণ চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ অনুধ্যানের অতীত, তবু স্মরণ করি সেই অমর বাণী –

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে।

গীতা সুগীতা কর্তব্যা। এর দোগ্ধা গোপাল নন্দন সব উপনিষদ সার দোহন করেছেন ভুক্তির জন্য নয়, মুক্তির জন্য এবং সে মুক্তি দেহ থেকে দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ নব মহোৎসব নয়, নিজের মধ্যেই 'আত্মজ্ঞানে, আত্মবিস্তারে আত্মপ্রসারে। সর্বযুগের সর্বকালের দর্শনের ইঙ্গিত এইখানে (perennial philosophy) – 'বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাসমদর্শিনঃ'। একালের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর (যেমন Teilhard de Chardin) গীতার সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন – 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মনোহন্যত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনঃ'। চার ধরণের মানুষের কথা গীতায় বলেছেন শ্রীভগবান - আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী। আমরা সবাই আর্ত, সকলেই কিছু না কিছু দৈহিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ক্লেশে ক্লিষ্ট। মন সংশয়াচ্ছন্ন, চিত্ত দোলায়মান, অবসাদ নেমে আসে, ক্লৈব্যে বিপাকে পড়ি। ফলে বিপদ ঘনিয়ে আসে সব দিক থেকে। যাঁর নাম করে 'সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে' তারই নাম ভুলে যাই।

আমার সামান্য বোধে আমি বুঝি যে পার্থসারথি চক্রকে কয়েকজনের একটি সাময়িক ধর্মসভা কিম্বা ঐ জাতীয় আলোচনা সমিতি করে রাখলে চলবে না। অবশ্য মহাপুরুষদের জীবনী আমরা পড়বো, গীতার মর্ম আমরা বোঝবার চেষ্টা করবো, পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শঙ্করাচার্য, মহাপ্রভু প্রভৃতির বাণী সযতনে শুনবো শ্রদ্ধা সহকারে, তারা লোকসংগ্রহার্য কি শিক্ষা দিয়েছেন তা জানবো। গানের সুরের আসনখানি পথের ধারে পেতে সঙ্গীতের দ্বারা উপাসনাও হবে, ভজন কীর্তনেও মনকে আরো উন্নত করাও চলবে, তবু প্রকৃত সন্ধান হচ্ছে পাওয়া নয়, 'হওয়া'।

এই চক্র বা সমাবেশ একটি আইনানুগ স্বীকৃত সমিতি। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬১ সালের ২৬নং আইনের বিধি অনুসারে নথিভুক্ত। সমিতির আদর্শ — প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুভাব আনয়ন, সংহতি, বিশ্বাস, সহযোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রেরণা দেওয়া। শুধু আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে নয়, দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও সমষ্টিগত সংঘবদ্ধভাবে - এটি একটি ধর্ম বিষয়ক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

এই চক্রের প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপক, ধারক ও বাহক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রীতিকুমার ঘোষকে আমাদের সসম্মান প্রণতি জানাই - তিনি একজন দ্রষ্টা ও স্রষ্টা পুরুষ, সমিৎপাণি সাধক। আমাদের সুযোগ্য ও উৎসাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীরেন মৈত্র মহাশয়ও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁকেও আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই। তিনিই এই গোষ্ঠীর প্রাণ, তাঁর চেষ্টাতেই এই চক্র ধীরে ধীরে শৈশব অবস্থা থেকে বেড়ে উঠেছে এক মহত্তর জীবনের আশায় - অকালমৃত্যুর কবল হ'তে।

আমরা আজ এমন এক জগতে বাস করছি যেখানে ভগ্নজীর্ণ কাঠের স্তূপ যেন ক্রমেই জমে উঠছে, যেখানে ঘৃণা, চাঞ্চল্য, সংশয়, তিক্ততার অভিজ্ঞতা বেড়েই চলেছে, নগ্ন লাভ লোভ ক্ষয়ক্ষতির হিসাবেই আমরা মগ্ন, সমাজজীবন খিন্ন শীর্ণ, সাধুতা, সততা, মমতা শুধু কথার কথা। এর উপর অর্থাভাব ত আছেই, জীবনযাত্রার' মানও নিকৃষ্ট। এই যে অসহায় অবস্থা, এটা কি শুধু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রতান্ত্রিক বস্তুবাদের ফল? তাতো নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এগিয়ে যাবেই, নিয়মও তাই, শতঘ্নী মারণাস্ত্রকে আমরা সাদর আহ্বানে আপ্যায়িত করবো না ঠিক, কিন্তু বিজ্ঞানের যে সুফল আমাদের নানা রোগবীজাণুকে হটিয়ে দেবে, অক্ষমতাকে সুস্থ সবল করবে, তাকে? নিশ্চয়ই শত অভিবাদন জানাবো। কিন্তু গলদ হচ্ছে যে আমরা নিজেদের উপরই আস্থা রাখতে পারছিনা, সমাজের বিচারের উপরও বিশ্বাস হারাচ্ছি। সামাজিক পরিবেশে নেই আশ্বাস - এককথায় আমরা চলেছি উদ্দাম বেপরোয়া হয়ে, সমাজের কল্যাণ আদর্শের প্রকৃত গণ্ডীকে পেরিয়ে – ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে কোথায় যেন সামঞ্জস্য নেই, সে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ্, সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শবাদীই হোক - আসল কথা আমরা যেন হারিয়ে যাচ্ছি। ধর্ম হচ্ছে জীবনের সর্বোন্নত মূহূর্তের সর্বোত্তম জিজ্ঞাসা, এটি হচ্ছে আচার-আচরণ গোঁড়ামী নয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে পড়ছে যে পৃথ্বী চেতনার উৎকর্ষের দিনে যদি পুরাণী প্রজ্ঞাকে আমরা পেয়ে থাকি, তবে সেই মহৎ অতীত মহত্তর ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে না কেন। কেউ কেউ বলেন যে পুরানো দিনের মানদণ্ডে আজকালকার যুগযন্ত্রণাকে মানা যায় না-তার তুলাদণ্ড আলাদা। তার উত্তর দিয়েছেন একজন নামী ভারতীয় সুধী যিনি

এখন আমেরিকায় অধ্যাপনা করেন। তিনি বলেন প্রাচীন দিনের মূল্যমানগুলি এখনও একেবারে অচল হয়নি, মানুষ শুধু খেয়ে পরে এমনকি জাঁক জমকে থাকলেই তার বেঁচে থাকার সার্থকতা নয়। হ্যাঁ, আজকের দিনে অর্থ চাই, সামর্থ চাই, সুনিয়ন্ত্রিত কিন্তু দেহাত্মিকা বুদ্ধি, সাময়িক উত্তেজনা ও ভোগেই মানুষের মনের শেষ তৃপ্তি আনেনা। সে চায়, কেবলই চায় আরো আরো - কিন্তু সে পাওয়ার শেষের শেষ নেই। তার মানস এমন ভাবে গঠিত যে সে কিছুদিন ভুলে থাকলেও সে চায় বুঝতে জানতে জরিয়ে জারিয়ে রসিয়ে এমন কিছু বস্তুর সন্ধান (যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ), যা তাকে মূহূর্তের ক্লেদ ক্লেশ কালিমা, অভাব অভিযোগ, উত্তেজনা উত্তাপ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে শাশ্বতের চিরন্তনের স্পর্শ দেবে, যা হবে আনন্দ পরমানন্দ। নরওয়ের লেখক নুট হামসুন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 'গ্রোথ অফ দ্য সয়েল' বা মাটির বৃদ্ধি বলে এক উপন্যাস লিখে নগরায়ণের বিরুদ্ধে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার সংগ্রামের গল্প। নরওয়ের আর এক লেখক জোহান বোয়ার লিখলেন 'দ্য গ্রেট হাঙ্গার' - মহাবুভুক্ষা, এক বৃহত্তমা ক্ষুধার আবেশ, যাকে উপশমিত করবে কোন ভোগ্য, ভোগ্যযোগ্য উপাদান? জানি সম্পূর্ণভাবে তাকে আয়ত্ত করা জন্মজন্মান্তরের কাজ, তবু চেষ্টা করি না কেন? অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য প্রতিদিন - এই ছিল আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার একটি দিক - নিজেকে সংযত সংহত করে কয়েক মুহূর্তের জন্যও সেই অনাদি অনন্ত অসীমকে বোঝবার চেষ্টা। এই পথে যাঁরা এগিয়েছেন, যাঁরা জ্ঞানীগুনী মহাজন গুরু, পথ প্রদেষ্টা, তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদেরই কীর্তিধ্বজা ধরে আমাদেরই হতে হবে আগুয়ান দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার পেরিয়ে। যাত্রী আমি ওরে, পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে। এই তো যীশুখ্রীষ্টের ক্রশবহন, এই তো নানা পথ - যত মত তত পথ - এই তো শ্রীঅরবিন্দের বাণী – মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় - সাবিত্রী যমরাজকে যা বলেছিলেন - ছেড়ে দিতে হবে সত্যকে, সত্যে বিধৃত যে তাকে অর্থাৎ সত্যবানকে। রবীন্দ্রনাথ তাই তো বললেন - ধর্ম মানে আর কিছুই নয়, মানুষের যা চির আদর্শ - সবার মাঝে সবার পিছে সবার নীচেও লুকিয়ে আছেন তিনি - সেই তো আমার

তিনি জীব আর শিব যে অপর নয়। কি হবে জেনে হেগেলের সঙ্গে সে মতের মিল আছে কিনা, মার্কস বা লেনিন তার কতটুকু নিয়েছেন! সবাই নমস্য। ভালো জিনিষ যেখান থেকে যেটুকু আসে সেই টুকুই লাভ যদি সত্যের ছাপ তাতে থাকে - জীবন দিয়ে জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়।

নিশ্চয়ই শুধু সাধনায় বুঁদ হয়ে থাকলেই চলবে না। অন্ন চাই - অন্নং বহু কুর্বীত - এতো আমাদেরই ঋষিদের কথা - প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই স্বাস্থ্য, চাই বল, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট - সে অপরিমেয় বিশ্বাসের ছবি কে দিতে পারে এনে? যিনি পারেন, তিনিই পার্থ সারথি। নিজেকে জানা চাই - আত্মানং বিদ্ধি - প্রাচীন ঋষিদের যুগ থেকে এই একই কথা সব নবী, কবি, ঋষির মুখে, আজকের বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের মুখে।

বর্তমানকালে যে যুগ সমস্যা চলেছে তার উত্তর শুধু প্রাচীনকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সিংহাসনে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করলেই হবে না, কট্টর নেতিবাদেও নয়, ভোগবাদেও নয়, ইতিবাদেও নয় - সবার সুষ্ঠু সাম্য বিধানে। আমাদের যাত্রাপথ দীর্ঘ - মাঝে মাঝে ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য আরাম ঘর বা পান্থশালার প্রয়োজন, তেমনি পথে প্রবাসে ক্লেশকষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতাও চাই, তপস্যাও সেইখানে-অনন্যমন হয়ে আত্মবিশ্বাসে যাত্রা। আবার শুধু বীরাসনে বসে ধ্যানমগ্ন হলেই বা কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে তন্ময় হলেই যে আমি এগিয়ে গেছি তা নয় - পথ অনেক, লক্ষ্য সেই এক, যার দ্বিতীয় নেই। এক কথায় নিজেকে আত্মবিস্তৃত নয়, আত্মবিস্মৃত করে দাও - পার্থ সারথিচক্রের অনুচ্চারিত জীবনবোধই হোক আত্মবিস্তার - সেটা ঘনীভূত হোক জীবনবেদে — জীবনবাদে নয়। সে জীবন তপস্যার জীবন হোক, গৃহীর জীবন হোক, ব্যবসায়ীর জীবন হোক, চাকুরীর জীবন হোক। একে অধ্যাত্ম বা অনধ্যাত্ম জীবন বলি, কিছুই যায় আসে না - আসল চাবিকাঠিটি যদি থাকে মনকে বড় করে দেখার, দৃষ্টিকে উদার করে দেবার, কর্মকে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত করবার। শুধু মন্ত্র পাঠ নয়, স্তোত্রগান নয়, বিশেষ পূজা যাগযজ্ঞ হোম নয়, তাদেরও প্রয়োজন নেই তা নয়, তবু আত্মবিচ্ছিন্নতাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় ভীতি। আজ তাই ‘এলিয়েনেশন’

নিয়ে পশ্চিমে চীৎকার উঠেছে - এই বিচ্ছিন্নতাবোধের আলাপ আলোচনা চলেছে। আমাদের আত্মকেন্দ্রিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই ব্যাধি — আত্মবিস্তারেই এই অশুভের শান্তি — তিনিই তিনি -তিনিই সব হয়েছেন - এ চিন্তা আমার আত্মমর্যাদায় ঘা দেয় কেন? এমন কি সামান্যভাবেও অপরের জন্য চিন্তা করে আমরা আত্মবিস্মৃত হই - আত্মবিস্তৃত নই। এর ফলে আমরা সব সময়েই অসুখী, অতৃপ্ত, চতুর্দিকে হাহাকার রব - নাই নাই। পার্থসারথি চক্রের আদর্শ যদি একজনকেও একটু শান্তির বারি প্রক্ষেপ করতে পারে, তবেই আমাদের এক পা এগোনোও সার্থক হবে। আমরা চাই আমরা যেন এই আশা ও আদর্শ সম্মিলিত ভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি।

আমার বক্তব্য দীর্ঘ হলো তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। রবীন্দ্রনাথের একট কবিতার কয়েকটি লাইন (যা শ্রীঅরবিন্দকেও এককালে অভিভূত করেছিল। উদ্ধৃত করেই আপনাদের পুনরায় সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও নমস্কার জানাই।

রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ বাণ স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কিনা উঠি অন্ধতামস গেছে কিনা ছুটি
রুদ্ধ নয়ন মেলি কিনা মেলি তন্দ্রা জড়িমা মাজিয়া।
এমন সময় ঈশান তোমার বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।
ভৈরব তুমি কী বেশে এসেছ ললাটে ফুঁ'সিছে নাগিনী ।
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল। সুপ্রভাতের রাগিনী।

.....

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

.....

মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খেলায়

মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে

এই তো পার্থসারথির আহ্বান আদেশ, উপদেশ —

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিতযাত্রী
তুমি চির সারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি
দারুণ বিপ্লব মাঝে শুভ শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখত্রাতা জয় জয় জয় হে

সেই পার্থসারথিকেই প্রণাম জানাই আবার-

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

পুরানো সেই ভ্রমণ কথা

শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য

মধ্যপ্রদেশ পর্ব

প্রথমেই বলা ভালো যদি ভ্রমণ-গাইড হিসেবে লেখাটা পড়তে বসেন তবে হতাশ হতে হবে, তবে অখ্যাত এক পথিকের পথ চলার আবছা স্মৃতিতে যদি আগ্রহী হন, মনে হয় পাতাগুলো ওল্টাতে মন্দ লাগবে না। যে সময়ের কথা লিখছি, সেই ২০০২ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে ICSE পাঠক্রমের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষা হতো ফেব্রুয়ারি শেষ অথবা মার্চের শুরুতে। আমার ছেলেও যেহেতু তখন ওই সিলেবাসের পড়ুয়া ছিল তাই শীতের দিনগুলোতে মন উড়ুউড়ু করলেও মার্চের প্রথম সপ্তাহের আগে ডানা মেলার তেমন সুযোগ থাকতো না। সমস্যাটা দশসালা হলেও বিশেষ করে ২০০২-এর উল্লেখ করছি কারণ খাজুরাহো, পাঁচমাড়ী আর জব্বলপুরের

যে অভিজ্ঞতা এখন লিখছি, সেটা ঘটেছিল মিলেনিয়াম বছর পার করে দু' বছর পর ওই মার্চ মাসেই।

খাজুরাহো যাওয়ার তখন সবচেয়ে ভালো উপায় ছিল 'শিপ্রা এক্সপ্রেস'-এ 'সাতনা' পৌঁছে সেখান থেকে পকেটের অবস্থা বুঝে বাস অথবা গাড়িতে চেপে বসা। খুব দরকার না হলে সেই সময় আমরা ছোট গাড়িকে দূরে রাখবারই চেষ্টা করতাম, তাছাড়া সকাল পার করা সাতনা স্টেশনের বাইরেই যখন খাজুরাহোগামী চলতি বাস মিলে গেল তখন তো আর প্রাইভেট গাড়ির প্রশ্নই ওঠেনি। সাতনা থেকে হীরের শহর 'পান্না' ছুঁয়ে খাজুরাহো মোটামুটি ১১৫ কিলোমিটার। সারারাত স্লিপার ক্লাসে ট্রেন জার্নির পর এই ঘন্টা তিনেকের বাসপথে যদি একটু ঝিমুনি আসে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আসবার সুযোগ পেলে তবে তো! চম্বলের ডাকাতদের গল্প তো সকলেই জানে। জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে তাদের অনেকেই আত্মসমর্পণ করার পর দস্যুরানি ফুলনদেবীও যে কালক্রমে রাজনৈতিক নেতা থেকে একেবারে পার্লামেন্টারিয়ান বনে গেছিলেন সে কথাও কারও অজানা নয়। কিন্তু এখনও যে পাবলিক বাসের মধ্যে পুলিশ পাহারায় কোন শৃঙ্খলিত ডাকাত দেখার মত পিলে চমকানো ঘটনার সাক্ষী হতে হবে সেটা সত্যিই ভাবতে পারিনি। সাধে কি এতবছর পেরিয়েও দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে? পরবর্তী কয়েক দিনে অন্ততঃ এটুকু বুঝেছিলাম যে মধ্যপ্রদেশের স্থানবিশেষে ডাকাতদল কিন্তু তখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

খাজুরাহো পৌঁছে প্রথমেই যেটা দরকার ছিল সেটা বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি একটা কোন ভদ্রগোছের হোটেল। সেদিক থেকে 'হোটেল হারমনি' ছিল একেবারে আইডিয়াল। পছন্দসই ঘরের ভাড়া বাজেটের বেশি হলেও চিন্তার কিছু ছিল না,

জানতাম মার্চের প্রথমে ফাঁকা হোটেলে সেধে আসা কোন গেস্টকেই তারা ফেরাবে না — হ্যাঁ, এমনকি আধা দাম অফার করলেও! খাবার ব্যবস্থা অবশ্য নিজেদেরই করতে হয়েছিল, সেটাও মিলে গেল সামনের এক চলনসই রেস্তোরাঁয়। তারপর ঘন্টাখানেক ভাত ঘুমে পথের ক্লান্তিকে বশ মানিয়ে সেদিনই শুরু হয়ে গেল আমাদের খাজুরাহো পরিক্রমা।

খাজুরাহো বিখ্যাত তার মন্দিরের জন্য আর এই মন্দিরের বেশির ভাগই তৈরী হয়েছিল চান্দেলা রাজবংশের স্বর্ণযুগে অর্থাৎ ৯৫০ থেকে ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।

১১৮২ সালে পৃথ্বীরাজ চৌহানের আক্রমণে চান্দেলারাজ পরাজিত হলেও সেই সময়কার ৮৫টি মন্দির স্ব-মহিমাতেই বিরাজ করছিল। কাল হল ১২০৩ সালে কুতুবউদ্দিন আইবকের খাজুরাহো অভিযান। শেষ স্বাধীন চান্দেলারাজ পরমর্দদেব হলেন পরাজিত এবং নিহত। ৬০০ বছরের জন্য পুরো এলাকা ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল ঘন জঙ্গলের অন্তরালে। হয়তো ভালোই হয়েছিল, তাই মুসলিম আক্রমণ সত্ত্বেও ২০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে থাকা ৮৫টি মন্দিরের ২৫টি অন্ততঃ এখনও রয়ে গেছে ৬ বর্গকিলোমিটার পরিমিত স্থানে পশ্চিম, দক্ষিণ আর পূর্ব গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে - নতুন করে ১৮৩০ সালে যাদের খুঁজে বার করেন ব্রিটিশ অফিসার টি. এস. বার্ট। কী আছে খাজুরাহের এই প্রাচীন মন্দিররাজিতে, যার জন্য ১৯৮৬ সালে এখানকার ‘গ্রুপ অফ টেম্পল’ ‘ওয়ার্ল্ড গ্রুপ অফ হেরিটেজ’-এ স্থান পেয়ে যায়? আছে নাগারা শৈলীর মন্দির - স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের না পাওয়া অভাববোধের পাথরে কোঁদা নিদর্শন। প্রেম এবং কামসূত্র এখানকার শিল্পের মূল উপজীব্য, তাই মিথুন মূর্তির প্রাধান্যই যেন বেশি। কোনও মূর্তিতে যেমন যৌনক্ষুধা পরিস্ফুট কোথাও বা

মূর্তি বিষাদময়। হিন্দু পুরাণের দেবদেবী, পরীরাও নেমে এসেছে স্বর্গের থেকে মন্দিরের স্থাপত্যে। নৃত্যরতা হরসুন্দরী, অপ্সরা আর সুন্দরীরা নানান ভঙ্গিমায় সজীব হয়ে উঠেছে বেলেপাথরের ভাস্কর্যে।

প্রধান অবশ্যই পশ্চিমের মন্দির গোষ্ঠী যেখানে লক্ষ্মী, বিশ্বনাথ, মাতঙ্গেশ্বর, জগদম্বা, চিত্রগুপ্ত এবং সর্বোপরি কান্ডারিয়া মহাদেবের মন্দিরসহ ১২টি হিন্দু মন্দির সার দিয়ে রয়েছে যেন এক পাথরের জাহাজ! সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে মন্দির, তাই দিনের শেষে শুরু করেও প্রথম রাতের আগে পশ্চিমের মন্দির দেখে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। ইতিমধ্যে খাজুরাহের মোটামুটি একটা আন্দাজ আমরা পেয়ে গেছি। নতুন সূর্যকে সাক্ষী করে বেরিয়ে পড়লে যে লাঞ্চের আগেই দক্ষিণ আর পূর্ব — দুই গোষ্ঠীর মন্দির দেখে নেওয়া যাবে সেটা তো দিব্য বোঝা গেছে। তবে 'দুলাদেও' আর 'চতুর্ভুজ' মন্দির সমন্বিত দক্ষিণ গোষ্ঠীর মন্দিরে পর্যটক তেমন না, যেমনটা হয় পশ্চিম অথবা পূর্বের মন্দির ক্ষেত্রে। পূর্ব গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য এখানে হিন্দু এবং জৈন মন্দিরের সহাবস্থান। তাই ব্রহ্মা, বামন, জাভারি মন্দিরের পাশাপাশি এখানে রয়েছে 'পার্শ্বনাথ' অথবা 'আদিনাথ' এর মন্দিরও। তবে পূবের গোষ্ঠীকে যে কারণে আজও মনে আছে তা কিন্তু বিশেষ কোন মন্দিরের জন্য নয়, বলতে পারেন জনাকয়েক ডাকাতের জন্য। দূর থেকেই দেখেছিলাম তারা আসছে। সালটা ২০০২ বলেই হয়তো এরা ঘোড়ায় চাপা চম্বলের দস্যু ছিল না, একেবারে বাইকে আরোহী মডার্ন ডাকাতের দল। ডাকাত বুঝলাম কিসে? প্রত্যেকের কাঁধে যে থ্রি-নট-থ্রি বন্দুক! সবে ক্যাপ্টেন থেকে আগের বছর মেজর হয়েছি, বন্দুক চিনতে কি আমার ভুল হয়! তবে ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে কিন্তু ভুলই হয়েছিল। যাদের ভয়ে সঙ্গের বেশির ভাগ টাকাই ১২ বছরের ছেলের জামার তলার গেঞ্জীর ভেতর

ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, তারা কিন্তু কোন পর্যটককে লুঠ করতে আসেনি, এসেছিল নিতান্তই কোনও দলীয় দুশমনের খোঁজে। বিপদ সেদিন ছিলনা সত্যি, কিন্তু মন সে কথা বোঝে কৈ? পূবের গোষ্ঠীর কথা ভাবলে এখনও সেই ডাকাতদের কথাই মনে পড়ে, মন্দির নয়!

খাজুরাহো- পাঁচমাড়ী- জব্বলপুরের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মনে হচ্ছে খুব সম্ভবত পিপারিয়া হয়ে পাঁচমাড়ী আমাদের ট্যুর প্ল্যানে ছিল না, নইলে কি আর জব্বলপুর থেকে আমাদের ফিরতি রিজার্ভেশন? আসলে দ্বিতীয় দিনের দুপুরেই খাজুরাহো পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় লাঞ্চের টেবিলে উপাদেয় মেনুর মত পাঁচমাড়ী হাজির হয়ে গেল। কোথাও কোন হোটেলে বুকিং নেই, মাঝপথের ট্রেনের টিকিটও নেই, তাই কোন পথে চলব সেই পরিকল্পনা পাল্টাতেও কোন অসুবিধা ছিল না। সমস্যা একটাই, সাতনা থেকে পিপারিয়া প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার। এতটা পথ উইদাউট রিজার্ভেশন যাওয়া যাবে তো? সত্যি বলতে কি ঘন্টা ছ'য়েকের অলমোস্ট 'স্ট্যান্ডআপ নিয়ার দ্য বেঞ্চ' জার্নির মাঝখানে জব্বলপুর নেমে যাওয়ার ইচ্ছে যে হয়নি তা নয়, তবে কম বয়সের তেজ আর পাছে পাঁচমাড়ী ফস্কে যায় — এই ভাবনা পিপারিয়ার আগে আর আমাদের ট্রেন থেকে নামতে দেয়নি। পিপারিয়া যখন পৌঁছলাম রাত তখন বারোটা। স্টেশনের পাশেই একাধিক হোটেল, কিন্তু আমরা যতই সে সবে ঢুকতে চাই মাঝরাতে এই ডাকাতের দেশে তারা দরজা খোলার সাহস দেখালে তবে তো! এরকম ক্ষেত্রে কয়েকবার স্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়ে সুরাহা হয়েছে, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। অনলাইনে রিটায়ারিং বুকিং সম্ভবত তখনও শুরু হয়নি তাছাড়া আর্মির কার্ড টাও সঙ্গে ছিল, তাই বাকি রাতটুকু কাটাবার জন্য ঘর পেতে আর আমাদের সমস্যা হয়নি। কিন্তু সমস্যার কি শেষ আছে? পরদিন

সকালে ব্যাগ গুছিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকেই বুঝলাম গণ্ডগোল আছে। ভ্রমণ-গাইড বলছে স্টেশনের বাইরে থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের পাঁচমাড়ীর জন্য হরবখত জিপ অথবা অটো পাওয়া যায় কিন্তু কোথায় কি! স্ট্যাণ্ড যে একেবারে সুনসান। ব্যাপারটা বোঝা গেল একটু পরেই। ১২ই মার্চের সে দিনটা যে ছিল শিবরাত্রি। সুতরাং ভক্তের দল যে সমস্ত গাড়ি ভাড়া করে শিবের দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সেটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের মত বেচারাদের জন্য বাসস্ট্যান্ডে একটা বড় বাস দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু তার টিকিট কাউন্টারে যা ভিড় — সে দিকে এগোয় কার সাধ্য! হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত মুশকিল আসান হিসেবে পেয়ে গেলাম বাসের সর্দারজি ড্রাইভারকে। পরদেশি দেখেই হয়তো সে আমাদের তিনজনকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে দিল ড্রাইভারের পাশের একদম সামনের সিটগুলোয়। বাস কন্ডাকটর আমাদের থেকে টিকিটের পয়সা চাননি, জানতো ওটা ড্রাইভারেরই প্রাপ্য। পথের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা একটাই — এক শিবভক্তের জ্যান্ত সাপ নিয়ে বাসে উঠে পড়া। খাজুরাহোর পথে ডাকাত সহ্য করেছি, ভেবেছিলাম পাঁচমাড়ীর পথে সর্পসঙ্গ সইতে হবে। সেটা অবশ্য হয়নি যাত্রীরা সমবেত ভাবে হৈ হৈ করে প্রতিবাদ করে ওঠায়। বাধ্য হয়েই শৈব সাধুকে মাঝপথে নেমে যেতে হয়। সাপ তার সঙ্গেই থাকে, আমাদের জন্য থাকে শুধুই তার অভিশাপ। পাঁচমাড়ী পৌঁছবার একটু আগে মনে হলো শিবরাত্রির এমন ভিড়ে হোটেলে জায়গা পাবো তো? মিছেই দুশ্চিন্তা! পাঁচমাড়ী বাসস্ট্যান্ডের খানিকটা আগে প্রচণ্ড ভিড়ের ঠেলায় যে বিশাল মাঠে বাসের চলা শেষ হতে বাধ্য হলো, সেখানেই শুধু অসংখ্য তাবুতে ভক্তদের ভিড়। আর হোটেল? মাঠ পেরিয়ে শহরে ঢুকতেই দেখি তারা যেন শূন্যবুকে পর্যটকের আশায় দিন গুনছে। বাছাবাছির ইচ্ছে ছিল না, খুব বেশি হলে তো দুটো রাতের মামলা। তাছাড়া হোটেল ‘মধুর মিলন’ এর ম্যানেজারকে যখন

দেখলাম এক হাসিখুশি সর্দার, তখন আর অন্য হোটেলের দরজায় উঁকি দেওয়ার কোন তাগিদ বোধ করিনি। পথের বিপদে ড্রাইভারের ভূমিকা যে তখন সব সর্দারকেই দেবদূতের আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

শিবরাত্রির পাঁচমাড়ীতে রাস্তায় যা ভিড় তাতে জিপ তো দূরের কথা অটো চলাও ছিল অসম্ভব। সেই কারণেই প্রথম দিনটায় পায়ে পায়ে পথচলা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য মহাদেও তথা সাতপুরা পর্বতমালার চিরহরিৎ অরণ্যসহ পাঁচপাহাড়ের দেশে পায়ে চলার আনন্দও কিছু কম নয়। ৩৫০০ ফুট উচ্চতা — সুতরাং আবহাওয়া একেবারে আইডিয়াল। তাই মাত্র দু' কিলোমিটার দূরে সরকারি উদ্যানের বিপরীতে 'পাণ্ডব গুহা' দেখতে আর অসুবিধা কোথায় — বিশেষতঃ যদি শুনি এই পাঁচ মাধি বা গুহার কারণেই নাকি এই হিলস্টেশনের নাম হয়েছে পাঁচমাড়ী। তাছাড়া দেড় কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে 'জটাশঙ্কর গুহা'। শিবরাত্রির দিনেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভক্তের ভিড় ক্রমশঃ উল্টোপথে অর্থাৎ পিপারিয়ার দিকে চলতে থাকে তবে দর্শনের সুযোগ আমরা নেবনা? পাঁচমাড়ী অবশ্যই শিবের বিচরণ ভূমি, কিন্তু শুধু সেই কারণেই তো সে আর 'কুইন অফ সাতপুরা' হয়ে যায়নি! আসলে গাছ, পাখি, সরীসৃপ আর প্রজাপতির শহরের আকর্ষণ বাড়িয়েছে কমপক্ষে এক ডজন জলপ্রপাত আর 'অপ্সরা বিহার' অথবা রজনী হ্রদের মত সুন্দর সব জলাশয়েরা। প্রথমদিন অবশ্য পায়ে হেঁটে স্নান ও চড়ুইভাতির স্বর্গ 'ফেয়ারি পুল' বা অপ্সরা বিহারে পৌঁছে গিয়েছিলাম। দেখেছি আরো খানিকটা হাঁটা পথের শেষে গড়িয়ে পড়া রূপালি ধারার 'রজত প্রপাত'ও। রজত প্রপাতেরই যে আরেক নাম 'সিলভার ফলস' সেটা দিব্যি বোঝা গেলেও প্রপাতের মাথায় ১৫০ ফুট ওপর থেকে আছড়ে পড়া জলের ধারাই যে 'বিগ ফলস', সেটা সত্যিই জানা ছিল

না। পাঁচমাড়ী পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ও ৪৪৩৬ ফুট উচ্চতার 'ধূপগড়'। শুধু উচ্চতা অথবা প্যানোরামিক ভিউ-এর জন্য নয়, ধূপগড় থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দুটোই এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। বুকে দম, পায়ে জোর আর সর্বোপরি হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকলে ১০ কিলোমিটার দূরের এই শৃঙ্গে ট্রেকিং করে যে পৌঁছে যাওয়া যায়না তা নয়, তবে পড়ে পাওয়া পাঁচমাড়ীতে আমাদের সময় যে একেবারে মাপা, তাই পরের দিন জিপের ভরসায় বাকি যা কিছু সম্ভব ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছিলাম রাতের আশ্রয় মধুর মিলনে।

পরদিন কাকভোরে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম শেষ যে সেই ধূপগড়ের মাথায় সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে, বাকি দিনটা কখনও জিপে কখনও বা পায়ে হেঁটে ঘুরলেও সব কিছু আর দেখে উঠতে পারলাম কই! পাঁচমাড়ীতে ছোট বড় বেশ কিছু জলপ্রপাত আছে তা তো আগেই বলেছি, তার মধ্যে সেরা অবশ্যই 'যমুনা প্রপাত' সাধারণ পর্যটকের কাছে যার নাম 'বী ফলস'। কেন এমন নাম হলো? ১১৫ ফুট ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া জল যেখানে এক সুইমিং পুল তৈরী করে ফেলেছে সেখানে পৌঁছবার আগেই বুঝেছিলাম কারণটা। সারা পথে যে ঝরঝর ঝরণার শব্দ শুনেছি সে যেন কোন ভ্রমরের গুঞ্জন! চোখ-কান দুটোই ভরে ওঠে বী-ফলস দর্শনে। আর রয়েছে ত্রিধারার 'ডাচেস ফলস'। তবে এই সুন্দরীকে কাছে পেতে কষ্ট আছে। ৩৩০ ফুট উচ্চতা থেকে একের পর এক তিন ধাপে নেমে উজ্জ্বল জলধারা যেখানে জলাশয় রূপে পর্যটককে আহ্বান জানাচ্ছে, সেখানে পৌঁছাতে চলতে হয় প্রায় চার কিলোমিটার পাথুরে পথ— ভাঙতে হয় ৬০০ থেকে ৭০০ খাড়াই সিঁড়ি। পথের শেষে ডাচেসের রূপে যদি অবগাহন নাও করেন, শুধু দর্শনেই যেন সব কষ্ট সার্থক।

সময় ছিলনা তাই মিলিটারি ব্যারাক পেরিয়ে দেখা হলনা 'লিটল ফলস' এর ডাউন ফল, ১৯৮১-র সাতপুরা ন্যাশনাল পার্ক আর শহরের উপকণ্ঠে লেকের কাছে ফরসিথ সাহেবের গড়া উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ১৮৬২'র মিউজিয়াম। লেক পর্যন্তই যখন পৌঁছাইনি তখন সেখানে নৌ-বিহারের প্রশ্নই ওঠেনা, তবে অনেকটাই পাওয়া আর খানিকটা না পাওয়া থাকলেও দিনের শেষে মনে হয়েছিল — ভাগ্যিস পাঁচমাড়ী কে বাদ দিইনি!

খাজুরাহো আর পাঁচমাড়ীর দিনগুলো যেহেতু একটু অন্যরকমের ঘটনাবহুল ছিল তাই লেখার সময় কলম বেশ তরতরিয়েই চলেছে, কিন্তু পাঁচমাড়ী থেকে পিপারিয়া হয়ে ট্রেনে জব্বলপুর পৌঁছে কি ভাবে যে বাসস্ট্যান্ডের কাছে হোটেল সূর্য (Suryaa) তে আস্তানা গেড়েছিলাম সে ব্যাপারে সব কিছুই কেমন যেন ধোঁয়াটে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে হোটেল হওয়ায় কম পয়সায় শহর দেখার যে সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, দু'দিনের ছোটাছুটিতে তার সদ্ব্যবহার ভালোভাবেই করেছি। জব্বলপুরের সেরা আকর্ষণ যে ‘ধুঁয়াধার’ আর ‘মার্বেল রক’ তা আর কে না জানে! এই দুই দেখতেই যেখান পর্যন্ত গাড়িতে আসা যায় তা হল ভেড়াঘাট — শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে। এখন হয়তো ভেড়াঘাট পৌঁছাতে বাস, অটো, গাড়ির কোন অভাব নেই, আমাদের ক্ষেত্রে নিজেরা গাড়ি ভাড়া না করলে সবচেয়ে সহজ আর সস্তার বাহন ছিল ভটভটি টেম্পো। সেই গাড়িতে শুধু গাদাগাদি করে মানুষই উঠত না, রজ্জুবন্দি হয়ে তাতে সাইকেলরাও জায়গা পেয়ে যেত। যাত্রী বলতে বেশির ভাগই স্থানীয় — যারা চলেছে মূলত পেটের ধান্ধায়, তাই বাইরের ট্যুরিস্ট বলে এখানেও চালকের নেক নজর আমাদের ওপর ছিল। হয়তো নিছকই ভদ্রতা, কিন্তু তার ফলে ভিড় টেম্পোতেও আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। ভেড়াঘাট থেকে

নর্মদার জলপ্রপাতের দূরত্ব এক কিলোমিটারের বেশি নয়, তাই পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যাওয়া যায় সেইখানে, যেখানে পুরো নর্মদা নদী শ'খানেক ফুট নীচে আছড়ে পড়ে দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে 'মার্বেল রক'-দের একবার স্পর্শ করবে বলে। তারপর? অমরকণ্টক থেকে উৎপন্ন হয়ে এই পশ্চিমবাহিনী নদী গুজরাটের খাম্বাত উপসাগরে মিশে যাওয়ার আগে মধ্যপ্রদেশেই ছুঁয়ে গেছে ওঙ্কারেশ্বর অথবা মহেশ্বরের মত মহাতীর্থদের। নর্মদার এই ঝাঁপ শুধু দৃষ্টি নন্দন নয়, রোমাঞ্চকরও বটে। একে তো পতনের সময় ধোঁয়ার মত জলকণা বাতাসে উড়িয়ে হয়ে উঠেছে 'ধূয়াঁধার', তার ওপর স্থানীয় ছেলেদের মরণঝাঁপ! একশো ফুট ওপর থেকে তারা জলের সাথে ঝাঁপ দিয়ে নিচে নেমে আসছে পর্যটকদের চোখের সামনে। কোন বীরত্ব বা চ্যালেঞ্জের কারণে নয়, সবটাই হচ্ছে পেটের তাগিদে— কয়েকটা টাকা রোজগারের চেষ্টায়। এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন।

অবশেষে মার্বেল রক্‌স! ভেড়াঘাট থেকে নর্মদা নদীতে পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় প্রায় তিন কিলোমিটার জলবিহার। দু'পাশে মার্বেল রকস, তারই মাঝে নৌকা চলে তরতরিয়ে। নীল জল নীল আকাশ - নর্মদার খাতে ম্যাগনেশিয়াম চুনাপাথরের খাড়া পাহাড় উঠেছে অন্ততঃ শ'খানেক ফুট। শিরা ফুটেছে কালচে সবুজ অথবা কালো আগ্নেয় শিলায়। দিনের আলোয় এ পাহাড় কখনও রূপালি কখনও বা ধূসর সবুজ। শুনেছি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের আলোয় মনে হয় যেন শ্বেত-মর্মরের মায়াবী জগতে পৌঁছে গেছি। পাথরের রূপে পাগল পারা হলেও জল থেকে কিন্তু সাবধান, কারণ নর্মদার গভীর জলে কুমিরও আছে। মাত্র আধ ঘন্টা! শেষ হয়ে যায় মার্বেল রক পরিক্রমা আর সেই সঙ্গে ইতি ঘটাতে হয় পুরানো সেই ভ্রমণ স্মৃতির।



বী ফলস, পাঁচমাড়ি



মার্বেল রক্‌স, জব্বলপুর

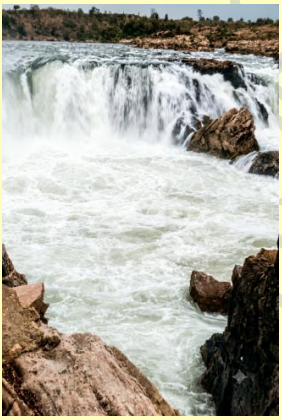

ধুঁয়াধার জলপ্রপাত



খাজুরাহোর মন্দির

প্যাপিরাসের পাতা

সুনন্দন ঘোষ

নীলনদের দেশে গেছিল অনুপ, আমার বাল্যবন্ধু।
এক সন্ধ্যায় আমাদের ফ্ল্যাটে হাজির,
হাতে একটা খাম,
তাঁর মধ্যে অচেনা কিছু ---
একটা প্যাপিরাসের পাতা।
“ওখানে তোর কথা খুব মনে হচ্ছিল।
এই প্যাপিরাসের পাতায় একটা কবিতা লিখিস
আমাদের বন্ধুদের জন্য।”

ছোটবেলায় গল্প পড়েছিলাম - থর হেয়ারডালের
আটলান্টিক অভিযান - প্যাপিরাসের ভেলায়।
সেই রোমাঞ্চ রয়ে গেছে আজও।
তাই প্যাপিরাসের পাতাটা থেকে গেছে আলমারিতে,
পরম যত্নে।
আঁচড় কাটতে পারিনি।

সারা জীবন পেয়ে গেলাম অনিঃশেষ।
ফেরৎ দিতে পারলাম কই?
যেদিন আমি থাকব না,
নীলনদ থেকে বয়ে আসা প্যাপিরাস থেকে যাবে
আমাদের বন্ধুত্বের নৌকা হয়ে।